পনের থেকে একুশ

আগষ্ট মাস। কেউ বলে শোকের মাস, কেউ বলে সুখের মাস। পৃথিবীতে উল্লেখ্যযোগ্য যা কিছুই ঘটে, কারও কাছে তা শোকের হয়, কারও কাছে বা সুখের। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাটি সাধারণ মুসলমানদের (এমনকি অমুসলমানদের কাছেও) পরম শোকবহ নিন্দনীয় ঘটনা হিসেবে প্রতিপালিত হবে চিরকাল, কিন্তু এজিদ-সীমার গোষ্ঠির কাছে এটি ছিল বিজয়ের দিন। বাংলাদেশের পঁচাত্তরের পনেরই আগষ্টের ঘটনাটিও কারবালার ঘটনার চেয়ে কোন অংশেই কম শোকবহ নয়। এই দিনটিকেও কেউ কেউ পরম সুখের দিন বলে মনে করে। শুধু মনে করে না, সে কথা বলেও থাকে বুক ফুলিয়ে। কেউ কেউ খুশীর জন্মদিন পালন করে এই দিন, কেউ বা পাশবিক উল্লাসে ফেটে পড়ে- "পঁচাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার। মুজিব হত্যার হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার"।

কারবালা ট্র্যাজেডির সাথে পনেরই আগষ্ট ট্র্যাজেডির আরেকটি চমৎকার সাদৃশ্য রয়েছে। কারবালাতেও শিশু হত্যা হয়েছিল, ইমাম হোসেনের শিশুপুত্রকে বধ করেছিল এজিদের সেনারা, হত্যাকে বৈধতা দিতে মোল্লারা পুর্বেই ইমাম হোসেনকে মুরতাদ আখ্যা দিয়েছিল (তারিখ-ই-তাবারি)। অর্থাৎ হোসেন হত্যার পেছনে তথাকথিত রাজানুগ্রাহী মোল্লাদের সক্রিয় সমর্থন ছিল। হোসন-বধ সম্পন্ন করে তার পবিত্র দেহের উপর ঘোড়া চালিয়ে দলিত পিষ্ট করে পরম ধার্মিক সীমার যখন দুই রাকায়াত শোকরানার নামাজ আদায় করছিল, তার পাগড়ির নীচে সযত্নে রক্ষিত ছিল সেই পবিত্র ফতোয়া। পনেরই আগষ্টেও নিক্সন-ভুট্টোদের ফতোয়ায় তাদের হুকুমের দাস বাংলাদেশী সীমাররা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে এসে হত্যা করেছিল ছয় বছরের নিস্পাপ শিশু, মেহেদীরাঙা নবপরিনীতা বধু, গর্ভবতী মা। এককথায়- হত্যা করেছিল মানবতা । কথিত আছে, কারবালা হত্যাকান্ডের পুরস্কার স্বরূপ সীমার দুই লাখ স্বর্ণমুদ্রা ইনাম পেয়েছিল। ঠিক একইভাবে পনেরই আগষ্ট হত্যাকান্ডের ইনামস্বপুপ মোশতাক-জিয়া এবং তাদের উত্তরসুরী নিজামি-খালেদাদের কাছ থেকে হত্যাকারীরা অব্যাহত ইনাম পেয়ে আসছে তিরিশ বছর ধরে।

আজ থেকে সত্তর বছর আগে নজরুল বলেছিলেন- 'ফিরে এলো আজ সেই মহররম মহিমা, ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'। অথচ তিরিশ বছর ধরে বাঙালি জাতি পনেরই আগষ্ট এলে শুধু মর্সিয়া গানই গেয়ে চলেছে অব্যাহতভাবে। হত্যার বদলা নেয়ার কোন কার্যকরী পদক্ষেপ জাতি প্রত্যক্ষ করেনি। তিরিশ বছরের অব্যাহত মর্শিয়াগীতির ডামাডোলে একটাই বাস্তব অর্জন- ছিয়ানব্বুইতে ক্ষমতায় এসে হত্যাকারীদের বিচার-কাজ সম্পন্ন করা। সে অর্জনও আজ ছিনতাইয়ের মুখে। খুনীদের দেশীবিদেশী গডফাদারেরা পর্দার অন্তরালে বসে আজও গুটি চেলে যাচ্ছে। চট্রগ্রাম বন্দরে ইতিহাসের বৃহত্তম অস্ত্র চোরাচালান এবং একুশে আগষ্টের গ্রেনেড হামলা সেই অব্যাহত প্রক্রিয়ারই অংশমাত্র। একুশে আগষ্টের আক্রমন যদি সফল হতো অর্থাৎ হামলাটি যদি শেখ হাসিনার কানের উপর দিয়ে না যেয়ে প্রাণের উপর দিয়ে যেতো, দেশে তাৎক্ষনিকভাবে এক ভয়াবহ রাজনৈতিক শুন্যতা ও অরাজকতার সৃষ্টি হতো। ঠিক পনেরই আগষ্টের মতো। সেই অরাজক অবস্থার সুযোগ নিয়ে জেলখানা থেকে দু'চারজন ফাঁসির আসামীর পলায়ন কোন ব্যাপারই না। আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোন নেতা আর জীবিত নাই। সুতরাং এই প্রলয়কান্ডের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী প্রতিরোধ গড়ে তোলার শক্তি দেশে থাকত না। পাঠক স্মরণ রাখবেন, একই দিন জেলখানার ভেতরে ঠিক একই মডেলের গ্রেনেড পাওয়া যায়। গুলিস্তানের অপারেশন সাকসেসফুল না হওয়াতে জেলখানার কুশীলবরা চক্রান্তের পরবর্তী অংশটুকু মঞ্চস্থ করার সুযোগ পায়নি, অর্থাৎ কিছু আর্জেস গ্রেনেড জেলখানার ভেতরে ফুটিয়ে সেখানে ভীতির ধুম্রজাল সৃষ্টি করে কয়েদীদের বের করে আনার অংশটুকু অভিনীত হয়নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পঁচাত্তরের খুনীরা জেলের ভেতরে বসেও (কিংবা প্রবাসে থেকেও) একের পর এক ঘুটি চেলে যাচ্ছে। তারা এই সুযোগ পাচ্ছে কারণ তাদের আসল শক্তি নেপথ্যের

গডফাদাররা এখন ক্ষমতায়। শুধু ক্ষমতায় না, আগামীতেও যাতে ক্ষমতায় আসা যায় সে নীলনক্সা চূড়ান্ত। শেখ হাসিনাকে এই কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে এখন। কীভাবে কী করবেন, সেটা তাকেই খুজে বের করতে হবে। বিগত দিনে যেসব পাহাড়প্রমান ভুল (যেমন গণভবন ইজারা নেয়া কিংবা তিরিশে এপ্রিলের কৌতুকাভিনয়) তিনি করেছেন, ভবিষ্যতেও সেরকম ভুল করলে শুধু যে তার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হবে তাই নয়, একাত্তরের অর্জন একেবারে মুছে যাবে। একাত্তরের ঘাতকরা মন্ত্রী হয়েছে, আগামীতে হয়তো প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি হবে এবং সোনার বাংলার পরিবর্তে পাকসারজমীন পত্পত করে উড়বে বাংলার আকাশে। শেখ হাসিনাকে মনে রাখতে হবে যে তিনি টুঙ্গিপাড়া গায়ের কাঁদামাটির গন্ধভরা মুজিব নামক একজন লোকের কন্যা যাকে বাংলার মানুষ ভালবেসে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনটি ছেড়ে দিয়েছে। মুজিবের রক্তের উত্তরাধিকারীর জন্যে প্রধানমন্ত্রীত্ব কিছু না। বঙ্গভবনের আলোঝলমলে আঙ্গিনার চেয়ে সুধাসদনের সহজ সরল অনাড়ম্বর পরিবেশেই তিনি বাঙালির অধিকতর আপন হয়ে উঠেন। তার বাপ-মা-ভাই-বোন সকলের রক্ত শুষে নিয়েছে এই মাটি, যেমন নিয়েছিল সিরাজুদ্দৌলা, ক্ষুদিরাম, তীতুমীর এবং সুর্য সেনদের রক্ত। সেই পবিত্র ভুমির উপর আজ শকুনী-গৃধিনীদের অশুভ ছায়া বিস্তৃত। সেই অপচ্ছায়াকে চিরতরে অপসারণ করাই হোক তার জীবনের মিশন, প্রধানমন্ত্রীর গদী করায়ত্ব করা নয়।

এই ব্রত নিয়ে যদি তিনি পথ চলেন, দেশের সাধারণ মানুষ তার পাশে থাকবেই। এই পথচলায় কিছু অমুল্য পাথেয়ও রয়েছে তার। ১৯৯৬-২০০১ সালের শাসনামলে ব্যর্থতার পাশাপাশি কিছু পজিটিভ অর্জনও রয়েছে তার ভান্ডারে। তার আমলেই বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জন করেছিল। জোট সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তখন সেই অর্জণকে ব্যাঙ্গ করে বলেছিলেন- খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণতা দেশের জন্যে মঙ্গালজনক নয়। অর্থমন্ত্রীর ব্যাঙ্গোক্তির সুতোয় চড়ে চালডালের দাম এখন আকাশে যেয়ে ঠেকেছে, নগদ ডলার খরচ করে বিদেশ থেকে (তাও আবার চিরশত্রু ভারত থেকে) পচা চাল কিনে সেই ব্যঙ্গোক্তির মাশুল গুনছেন তিনি। দ্রব্যমুল্যের লাগামহীন পাগলা ঘোড়া জনজীবনকে এমনভাবে বিপর্যস্ত করেনি শেখ হাসিনার আমলে। প্রকৃতপক্ষে তার শাসনামলের পাঁচটি বছর দ্রব্যমুল্য একেবারেই স্থিতিশীল ছিল। তার আমলেও সন্ত্রাস ছিল, কিন্তু সন্ত্রাসের এমন সর্বগ্রাসী থাবা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেনি। ক্লিন হার্ট, র‍্যাব, কোবরা, চিতা, ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার ইত্যাদি ভয়ংকর টার্মগুলি বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে জমা হয়নি। তার আমলেও দুর্ণীতি ছিল, কিন্তু জাতীয়তাবাদী লেবাস পড়িয়ে দুর্ণীতিকে এভাবে জাতীয়করণ করা হয়নি। বিশ্বের সর্বশেষ্ঠ দুর্ণীতিপরায়ন দেশ হিসেবে হ্যাট্রিক অর্জন করা সম্ভব হয়নি। জনগণকে জোট সরকার যতোই বোকা ভাবুক, জনগণ যতোই বিস্মৃতিপ্রবন হোক- স্বাধীনভাবে ভোট দেয়ার অধিকার পেলে জবাব তারা দেবেই। এ বিষয়ে শেখ হাসিনা হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর থাকতে পারেন।

শেখ হাসিনার সামনে এখন যা করার- তা হলো আগামীতে যাতে দেশে একটা নিশ্চিত নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার জন্যে জীবনপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। খালেদা-নিজামির ছকবাধা নির্বাচনী ফাঁদে যদি তিনি একবার পা দেন, নিজেও ডুববেন, দেশও ডুববে।

কোন চক্রান্ত করে নয়, কোন বিশেষ পাড়ার সহযোগিতা নিয়েও নয়- একমাত্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ রায়ই পারে পঁচাত্তরের হত্যার বদলা নিতে।

ছগীর আলী খাঁন

ভাটপাড়া, সাভার- ঢাকা

আগষ্ট/ ২০০৫